বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৪১-২৫০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে শিশু অধিকার: বাস্তবতা এবং আমাদের করণীয়

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারসংক্ষেপ *আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার মতো একটি মৌলিক বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। উন্নয়নে শিশুদের বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর সংজ্ঞা, শিশুদের বর্তমান বাস্তব চিত্র, শিশুদের পরিবেশ কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়—এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়নে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।*

মূল শব্দ *শিশু অধিকার · টেকসই উন্নয়ন · দক্ষ জনসম্পদ · শিশু শিক্ষার ইতিহাস · শিক্ষকতা পেশা*

১. ভূমিকা

আমাদের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত আজকের শিশুদের আগামী দিনের যোগ্য ও দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ জন্যে শিশুরা কীভাবে বেড়ে উঠছে, তাদের নিরাপত্তা, বিনোদন এ বিষয়গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি নিরাপদ, সুন্দর সাবলীল আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করা। রূপকল্প ২০২১ এ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ইতিমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDG) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারনা। উন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন দক্ষ জনসম্পদ। আজকের শিশু ২০৪১ সালে হবে দেশের কর্ণধার। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং আজকের শিশুরা কিভাবে বেড়ে উঠছে তা নিয়ে ভাবতে হবে। এখানে সুন্দর ভবিষ্যৎ বলতে স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও শান্তিতে ভরপুর একটি উন্নত সমাজ ইত্যাতি বোঝাতে চাই। আর বেড়ে ওঠা বলতে বোঝাতে চাই আমাদের শিশুদের বিনোদন সুবিধাসহ নিরাপত্তা, হাসিখুশি, কোলাহলমুখর পরিবেশে বড় হচ্ছে কি না এবং একই সাথে সব শিশু সমভাবে সুযোগ পাচ্ছে কি না। প্রশ্ন হলো উন্নত দেশে উন্নীত হতে যে জনসম্পদ প্রয়োজন হবে তা গড়তে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু? বলা হয়ে থাকে ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট
ই-মেইল: jasim_uddin90@yahoo.com

সমাজের একজন অগ্রসর নাগরিক হিসেবে, একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে, নীতি নির্ধারক-রাজনীতিবিদ হিসেবে, একজন প্রশাসক হিসেবে, গণমাধ্যম কর্মী, জন প্রতিনিধি তথা একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব শিশুদের জন্য সুন্দর, নিরাপদ ও সুস্থ ধারার পরিবেশ তৈরী করা যাতে তারা আনন্দের সাথে বেড়ে উঠতে পারে। শিশুরা সুশিক্ষিত, সৎ ও আদর্শবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্র তেরী করতে হবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ ধারায় উল্লেখ আছে, establishing a uniform, mass-oriented and universal system of education and exten-ding free and copolsary education to all children to such stage as may be determined by law (একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য)। সুতরাং শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার এই সাংবিধানিত দায়িত্ব আমাদের অত্যন্ত যত্নসহকারে সুচারুভাবে পালন করতে হবে। পৃথিবীর বর্তমান অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি শিক্ষা। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে সবার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। একজন শিশুকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যেখানেই থাকুক যে অবস্থাকেই থাকুক পরিণত বয়সের একজন মানুষ হিসেবে আমাদের এমনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করতে হবে। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে সবার আগে শিশুদের জন্য যেকোনো মূল্যে একটি সুস্থ ধারার ক্ষেত্র তৈরি করা আবশ্যক।

আলোচ্য প্রবন্ধে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সুন্দর ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলতে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু—এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আজকের শিশুদের উন্নতর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু এবং শিশুদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. শিশুর সংজ্ঞা এবং শিশুর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করা।

২. বাংলাদেশে শিশুশিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুলে ধরা।

৩. শিশু অধিকার একই সাথে শিশুদের বেড়ে ওঠার বর্তমান বাস্তব চিত্র তুলে ধরা এবং শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে আলোকপাত করা।

৪. শিশুদের জন্য একটি কার্যকর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং দেশের প্রকৃত উন্নয়নের প্রয়াসে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. তথ্যের উৎস

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস হতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' গ্রন্থটিকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর লেখকের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. শিশুর সংজ্ঞা এবং শিশুর অধিকার

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ১৪ বছর কম ছেলে মেয়েদের শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিশুদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করার রীতি প্রচলিত; ৫ বছরের নীচে শিশু, ৬ থেকে ১০ বছর বালক এবং ১১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত কিশোর। একজন শিশুর বয়স একেক দেশে একেক রকম হয়ে থাকে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন ও প্রথাকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৮ বছরের কম বয়সের সবাইকে শিশু হিসেবে গণ্য করে। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই সনদ মেনে চলে। সুতরাং ১৮ বছরের নীচে সকল ছেলেমেয়েকেই শিশু বলে অভিহিত করা যায়।

১৯২৪ সালে লিগ অব নেশনস্-এর পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশু অধিকারসমূহ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক দলিলে স্থান পায়। পরে ১৯৫৯ সালের শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের অনেক সুবিধা, তাদের নিরাপত্তা ও অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ৩০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার কনভেনশন গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করে।

বাংলাদেশে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করণের ও সংরক্ষণের সাংবিধানিক বিধান ও আইন রয়েছে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন ও ১৯৭৬ সালে শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগস্ট, ১৯৯০ বাংলাদেশ জাতিসংঘের Convention on the Rights of the Child (CRC) স্বাক্ষর করে এবং CRC বা শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং বিভিন্ন ধারা সমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় শিশু নীতিমালা প্রণয়ন করে। এটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত যেখানে প্রথম অধ্যায়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিশুদের জন্য সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উপসংহারে বলা হয়েছে যে, জাতীয় শিশু নীতির আওতায় বাংলাদেশের সকল শিশু গোত্র বর্ণ লিঙ্গ ভাষা ধর্ম বা অন্য কোনো মতাদর্শ সামাজিক প্রতিপত্তি সম্পদ জন্ম বা অন্য কোনো মর্যাদা নির্বিশেষে সকল অধিকার ও সুবিধা সমূহ সমান ভাবে ভোগ করবে।

৫. বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার ইতিহাস

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুর মধ্য দিয়েই এদেশে আধুনিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। এদেশে এই আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন করে বৃটিশরা। এর আগে মধ্য যুগে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল। মুসলিম ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ছিল মসজিদ বা মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যাকে বলা হতো মক্তব এবং হিন্দু ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক যাকে বলা হতো পাঠশালা। সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। বিনিময় প্রথা চালু ছিল বলে শিক্ষকেরা সম্মানী হিসেবে ধান, চাল বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতের। শিক্ষকেরা নামমাত্র সম্মানীতে শিক্ষকতা করতেন। সম্মানী কম হলেও পরম যত্ন ও মমতা নিয়ে শিক্ষাদান করতেন। শিশুদের কাছে তাঁরা ছিল পরম পূজনীয়। সমাজে তাদের আলাদা সম্মান ছিল। শিক্ষকতার পেশায় কেউ কখনো ধনবান হয়নি। কিন্তু শিক্ষকেরা সবসময় যে কোনো ধনবান, এমনকি ক্ষমতাবান ব্যক্তির চেয়ে বেশিই সম্মানীয় ছিলেন। এ জন্যেই প্রবাদ চালু হয়েছিল “রাজা স্বদেশে সম্মান পান বিদ্বান সম্মান পান সর্বত্র”। ব্রিটিশরা আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তন করলেও জনস্বার্থে তা করেছিল এ কথা বলার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে ১৮৩৫ সালে মেকলের সুপারিশকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা উল্লেকখ করা যেতে পারে। মেকলে প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার

উদ্দেশ্য ছিল, " a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes –in opinions, in morals and intellect" (এদেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থ্যা চালু করা যাতে এদেশের মানুষ রক্তে মাংসে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে মতবাদে হবে ইংরেজ)। মেকলে নির্দেশিত সেই শিক্ষা কাঠামোটি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হলেও এখনও বলবৎ আছে। এটি স্বীকার করা ভালো।

যা হোক আগে শৈশবে অনেক প্রতিকূলতা, অনেক সীমাবদ্ধতা মেকাবেলা করে এদশের অনেকেই চরম ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনুকরণীয়। শফিউল আলম তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "১৯৪৬ সালের ভোর বেলা। সেবার তুফানে আমাদের গ্রামের মূল স্কুল ভবনটি ভেঙ্গে যাওয়ায় নদীর পারে বাঁশঝাড় আর কাঁঠাল বাগানের পাশে আমাদের স্কুল বসেছে। বাঁশের খুঁটিতে টিনের চালের নীচে ভাঙাচুরা টুলে বসে সরবে সানন্দে উৎসবের কোরাস তোলে পড়ছি আমরা, স্পষ্ট মনে পড়ছে। পড়ছি পদ্য, পড়ছি নামতা"। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "খোলা জায়গায় ভোরবেলায় ক্লাস করার যে কী আনন্দ এখনও মনে দোলা দেয়- ভাবি সেই বয়সে, সেই গ্রামে, সেই কোরাসে আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম"। আগে এত সুন্দর সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা, শিশুদের জন্য এত এত সুযোগ সুবিধা ছিলনা, সকল শিশুদের পড়াশুনার সুযোগ ছিলনা। আজকের দিনের মত এত এত উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক ছিল না। কিন্তু একটি মৌলিক বিষয় শিশুদের বিনোদনের সুযোগ ছিল প্রচুর। পড়াশোনায় শিশুরা আনন্দ পেত অনেক, খেলাধুলার মতো অনাবিল বিনোদনের খোরাক ছিল বিভিন্ন উপাদানে। শিশুদের সর্বত্র নিরাপত্তা ছিল। শিক্ষকদের আন্তরিকতা ছিল। নামমাত্র সম্মানী বা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করলেও আজকের যুগের শিক্ষকের মতো তাদের বাণিজ্যিক মনোভাব ছিল না। ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক ছিল মধুর এবং তা সারাজীবনের জন্য। নিরাপদ ও আনন্দময় শৈশবের উপস্থিতি ছিল সর্বত্র।

৬. শিশুদের বেড়ে ওঠার বর্তমান বাস্তব চিত্র

বাংলাদেশের শিশুদের ক্ষেত্রে দু রকমের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। একদিকে রয়েছে শহুরে শিক্ষিত, স্বচ্ছল ও সচেতন পরিবারের ছেলেমেয়ে। অন্য দিকে শহরে ও গ্রামের শিক্ষা বঞ্চিত, দরিদ্র ও অসচ্ছল অভিভাবকদের ছেলে মেয়ে। আগে গ্রাম ও শহরের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিলনা। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হতোনা। গ্রামে এক সময়ে হরেক রকমের খেলাধুলার প্রচলন ছিল। এসকল খেলাধুলা প্রচীন কাল থেকে যুগের পর যুগ চালু হয়ে আসছে। এসকল খেলাধুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এগুলোতে আনন্দের খোরাক ছিল প্রচুর। এসকল খেলাধুলায় প্রচুর শারিরীক পরিশ্রম হতো, একজন আরেক জনের সাথে মত বিনিময় হতো, কথা কাটাকাটি হতো ইত্যাদি কারণে শিশুদের সামাজিক হতে উদ্ভূত করতো। এককে মৌসুমে এককে রকমের রকমের খেলার প্রচলন ছিল। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট ছিল এসকল খেলাধুলায় কোনো খরচ ছিল না এবং থাকলেও তা ছিল নামমাত্র। এছাড়া ঘুড়ি ওড়ানো, মাছ ধরা, বারুনীমেলায় যাওয়া, বাবা-মার হাত ধরে নানা বাড়ি যাওয়া, বড়দের সাথে হাটে যাওয়ার মতো আনন্দ তো ছিলই। এসব খেলাধুলার প্রচলন অনেক কমে গেছে। তদুপুরি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। শহরে এসকল খেলাধুলা হয় না বললেই চলে। খেলাধুলার পরিবর্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার নামে কম্পিউটার গেইম, কার্টুন, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ফেইস বুকের মত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি শিশুরা আকৃষ্ট হচ্ছে। আধুনিক বিনোদনের নামে এই বিনোদন মূলত কোনো সুস্থ ধারার বিনোদন নয়। সুস্থ ধারার বিনোদন বঞ্চিত হয়েই শহরের শিক্ষিত ঘরের শিশুরা বেড়ে উঠছে বা বেড়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুরা গৃহে অন্তরীণ থাকছে এবং আধুনিক বিনোদনের নামের এসব বিনোদনে আকৃষ্ট হয়ে শিশুদের মানসিক বিকাশ দারুনভাবে

বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে বিনোদনের সুযোগ ও ক্ষেত্র দিনে দিনে সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। শহুরে শিশুদের একটি বিশেষ দিক হলো তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রধান্য দেওয়া। অভিভাবকরা প্রথম নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই এবং যৌক্তিক কারণেই নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে চিন্তা করতে হয়। যেসব পরিবারে বাবা- মা দু'জনেই কর্মজীবী সেসব পরিবারের শিশুদের পড়াশুনার বিষয়টি আরো নাজুক। সঙ্গত কারণেই এধরনের অবস্থান শিশুদের আত্ম কেন্দ্রিক,স্বার্থপর ও অসামাজিক হয়ে উঠতে প্ররোচিত করবে। অন্যদের সাথে মিশতে বা সাবলীল ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করে। গৃহে অন্তরীণ থাকার সুবাদে চোখে সমস্যা, স্থুলতা, মাথা ও বুকে ধরা সহ নানবিধ শারিরীক ও মানসিক জটিলতার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তো আছেই। এদিক থেকে গ্রমের শিশুরা মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলেও তারা গুণগত শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রামের শিশুদের অনেকেই স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না, ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়ছে বা অভাবের তাড়নায় বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত হয়ে উপার্জন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিনয় মিত্র তার বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ ও রীতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শত বিভক্ত শিশুদের একই মালায় গাঁথার জন্য অভিধাটি (পঞ্চপান্ডব) নিলাম। এই পাঁচজন, পাঁচ প্রকার বিদ্যালয়ে যায়, পাঁচ রকমের বই পড়ে, পাঁচ রকম পরিবেশে বড় হয়। এদের বাইরে, আরো একজন আছে, যে জন্ম থেকে শিক্ষা বঞ্চিত, বাকি পাঁচজন থেকে আলাদা, সে যেন কর্ণ, কুন্তীর সন্তান হয়েও সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত। এই কর্ণধর্মীরা বেড়ে উঠছে শ্রম বিক্রি করে—খেয়ে না খেয়ে, শোচনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের শিশুদের একটি অংশ প্রতিবন্ধী ও অটিটিস্টিক। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় দশ ভাগ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। এদর বেশির ভাগই পরাশ্রয়ী। এদের জন্য বিভিন্ন এনজিও, প্রতিষ্ঠান নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এ দেশে অনেক প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু এসকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে।

আজকের সময়ে শিশুদের একটি বিরাট অংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। ইভটিজিং, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এমনকি রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। গত ১০ মার্চ, ২০১৮ কালের কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেছে। কোথাও বন্ধুদের হাতে খুন হচ্ছে স্কুল বা কলেজগামী শিক্ষার্থীরা। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, যেখানে মা-বাবা দিনের বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকেন, সেখানে উঠতি বয়সীদের দেখার কেউ নেই। এই সময়ে সহজলভ্য প্রযুক্তি একজন কিশোর বয়সীকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে, তা কেউ বলতে পারে না। আগের দিনে পাড়া-মহল্লায় সামাজিক অনুশাসন ছিল। আজকের দিনের নাগরিক জীবন থেকে সামাজিক অনুশাসনও উধাও হয়ে গেছে। পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন ও মূল্যবোধের অভাবেই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। হাত বাড়ালেই মিলছে ভয়ংকর মাদক। যে সময়ে একজন কিশোর বা তরুণের মনোজগৎ তৈরী হয়, সেই সময়ে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে অপরাধ জগতের সঙ্গে। এসব কারণেই পাড়া-মহল্লায় গড়ে উঠছে গ্যাং গ্রুপ। রাজধানীতে এমন কিশোর গ্যাংয়ের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে অনেক কিশোর। শিশু-কিশোরদের বিপথগামী হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এদের মধ্যে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবার ও সমাজের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণও এর জন্য দায়ী। শিক্ষকরা আগের মত দরদ আর মমতা দিয়ে বিদ্যা দান করতে চায়না। শিক্ষা যেখানে পণ্য, শিক্ষকও তো সেখানে পণ্য বিক্রেতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। সেই পণ্যবিক্রেতা শিক্ষকের কাছে বড়ো কিছু মহৎ কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের সমাজে

শিশু কিশোররা বিপথগামী হওয়ার জন্যে শিক্ষা বাণিজ্যিকরণও অনেকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজে দেখা যায়, সন্ধ্যার পর এমনকি গভীর রাতেও এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ শিক্ষার্থী রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, খেলার মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে আড্ডা দিতে দেখা যায়। পড়ার সময় পড়ার টেবিলে না বসে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষি০ত সুযোগের সহজলভ্যতা তরুণ শিক্ষার্থীদের বিপথগামী হতে প্ররোচিত করে। আমাদের মত দেশে তরুণ শিক্ষার্থীরা ক্রমবর্ধমান হারে বিপথগামী হচ্ছে তা কোনোমতেই কাম্য নয়।

২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৩.৫ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ধরে নিলে বাংলাদেশে বসবাসকারী দরিদ্র জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৪ কোটি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা কত তার সঠিক তথ্য জানা না থাকলেও এর পরিমাণ কম নয়। এদের অধিকাংশই মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশু শ্রম আমাদের দেশে একটি অমানবিক দিক হলেও অভাবের তাড়নায় এদেশে অনেক শিশু বিভিন্ন কাজে এমনকি ঝঁকি পূর্ণ কাজে জড়াতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে পথশিশু। একজন শিশু রাস্তা, আঁস্তাকুড় ও অন্যান্য স্থানে জিনিসপত্র কুড়িয়ে বেঁচে থাকে। বেশিরভাগ পথ শিশুদের পিতামাতা নেই। অনেকের পিতামাতা আছে কিন্তু যোগাযোগ নেই। শিশুরা দারিদ্র্য, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, পরিবার থেকে পলায়ন ও যৌন নিপিড়নের কারণেই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়। কেউ তাদের দেখাশুনা করেনা। তারা রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, অফিস চত্বর, পার্ক, রাস্তার ধারে ও খোলা আকাশের নীচে বাস করে। পথ শিশুদের অনেকেই পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছেনা। তারা অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা বৃত্তি, মাদক ব্যবসা, মাদকাসক্তি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

৭. শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত

শিশু এবং বিনোদন হবে একে অপরের পরিপূরক। অবোধ শিশুদের জন্য জন্য আমাদের যা যা করা দরকার তার সবই করতে হবে। আনন্দের মধ্য দিয়ে আমাদের শিশুরা বেড়ে উঠবে, শিখবে, জানবে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে এমন কিছু যুক্ত করতে হবে যেথানে শিশুদের জন্য প্রচুর বিনোদনের খোরাক থাকে। বিনোদন ব্যতিত শিশুদের জীবন পূর্ণতা পায়না। আমাদের দেখতে হবে শিশুরা বেড়ে ওঠার পাশাপাশি বিনোদন সুবিধা কতটুকু পাচ্ছে। তাদের জন্য যথাযথ সুস্থ ধারার বিনোদন নিশ্চিত করতে পারছি কিনা - তা পরখ করে দেখতে হবে। টেবিলমুখী মানসিকতা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সহায়তা করবে। শিশুদের টেবিলমুখী করে তোলা আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। একই সাথে তাদের নিরাপত্তা, সুস্থ ধারার বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার অবাধ সুযোগ করে দিতে হবে। শিশুদের জন্য শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন সব খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে এবং একই সাথে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নির্শ্চিত করতে হবে। জন্মের মূহূর্তের পূর্ব থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। দার্শনিক লক্‌ বলেছিলেন, জন্মকালে শিশুর মন হচ্ছে অলেখা কাগজের মতো তাতে কোনো অভিজ্ঞতার দাগ পড়েনি। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানী বা মনোবিদ্‌ এ কথা সত্য বলে মনে করেন না। জন্ম মূহূর্তের বহু পূর্বে মাতৃগর্ভেই তার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা লাভ শুরু হয়ে গেছে। এ কথাও মনে করা ভুল যে, শিশুর মন হচ্ছে 'নরম কাদা', তাকে যেমন খুশি করে গড়ে তোলা যায়। শিশুরা শিখবে সব ভালো দিক শিখবে। শিশুরা অভিজ্ঞতা লাভ করবে সব ভালো ও মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আজকের শিশুরা হবে আগামী দিনের কর্মচঞ্চল, বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনসম্পদ যেন বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানানসই সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ একই সাথে ঔপনিবেশিক শোষণ, দেশের বাস্তব সমস্যা, আর্থ-মাজিক অবস্থা সম্পর্কে শিখবে, নিবিঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, উপলব্ধি করবে, সমস্যা সমাধানে প্রলুব্ধ হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন

হওয়া জরুরি যেখানে আমাদের শিশুরা শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞানার্জনের প্রতি নিবেদিত হয়ে ওঠে এবং পরিণত বয়সে দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমী বিশেষ করে বঞ্চিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। একই সাথে আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী, কর্মচঞ্চল মানুষ হিসেবে দেশের একজন বলিষ্ঠ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমাদের উচিত শিশুদের জন্য এ রকম একটি সুস্থ ধারার পরিবেশ বা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। শিশুরা পরিণত বয়সে দুর্নীতিবাজ হবেনা বরং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্ছার হবে, পাপাচার বা অনাচারে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেনা বরং অন্যায়-অনাচার দমনে বাস্তব সম্মত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে প্রলুব্ধ হবে। আর এজন্য আজকের শিশুদের সত্যিকার জ্ঞান পিপাসু, সুশিক্ষিত, সৎ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলতে এখনই কার্যকর ও বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. সুপারিশমালা

শিশুদের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা, তাদের অধিকার ও তাদের নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং শিশুরা যাতে আনন্দ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। শিশুরা সব সময়ই থাকবে হাস্যোজ্জ্বল। আনন্দ আর বিনোদনের মধ্য দিয়ে তারা বেড়ে উঠবে। আর এ বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেকোনো মূল্যে। আনন্দ আর হাসির মধ্য দিয়ে তারা পড়াশোনা করবে, শিখবে। আজকের শিশুরা পরিণত বয়সে হবে সমাজ সচেতন, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানপিপাসু। শৈশবেই তাদের মনোজগতে এ মানসিকতা গড়ে উঠবে। এ মানসিকতা অর্জন করতে একটি সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুরা গড়ে উঠবে মুক্ত মনের মানুষ হিসেবে। আজকের বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার সুদূর প্রসারি ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা তৈরী করা জরুরী। এলক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. শিশুদের জন্য একটি বস্তুনিষ্ঠ শুমারি জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে । শিশুরা কীভাবে শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করছে। একই সাথে তাদের বিনোদনের সুবিধা কী রকম। কোন শ্রেণির শিশুরা অধিক সুবিধা ভোগ করছে। কারা বঞ্চিত হচ্ছে। একটি বস্তুনিষ্ঠ কার্যকর গবেষণা সম্পাদন করেই দীর্ঘ মেয়াদে যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক জনসম্পদ গড়ে উঠতে পারে তার একটি সুন্দর ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

২. দেশের অনেক শিশু শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করার প্রাক্কালে এ ধরনের অবস্থা অপ্রত্যাশিত হলেও বাস্তব চিত্র আসলে তাই। সুতরাং অনগ্রসর এলাকা, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী জন্য মানসম্মত বিশেষায়িত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে এ দেশের সব পথশিশু, অনাথ, অসহায়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য একটি আর্থিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলতে হবে যাতে দারিদ্র্যের জন্য বা অর্থাভাবে তাদের পড়াশোনা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩. শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে শিশু পুলিশ গড়ে তুলতে হবে।

৪. সন্ধ্যার পর কোনো শিশু বাড়ির বাইরে যেতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রতিটি শিশুর পড়াশোনার সময়। এ সময় বাড়ি বা বাসার বাইরে থাকার প্রবণতা রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনপ্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. ভার্চুয়াল জগতের যেটুকু শিক্ষণীয় শুধ সে টুকুই শিশুদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। শিশুরা যাতে ভার্চুয়াল জগতের সাথে আসক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্র জীবনে কোন শিশু যাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো সাইটের সাথে আসক্ত হয়ে না পড়ে তাদের শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট বা ভার্চুয়াল জগৎ নয় পড়াশ্নোই হবে শিশু-কিশোরদের বিনোদনের প্রধান উৎস। আজকের শিশুরা আগামীতে যাতে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলো আয়ত্ত করে, উপলব্ধি করে তা সমাধানে এগিয়ে এমন একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

৬. খেলাধুলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্র, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তরুণ-শিশু-কিশোরদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা জরুরি।

৭. শিশুরা ভালো সবকিছুই শিখবে এবং নেতিবাচক সবকিছুই বর্জন করবে। শিশুদের মধ্যে আড্ডার বিষয়বস্তু হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহামানুষের জীবনী নিয়ে পর্যালোচনা। অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, জ্ঞানপিপাসু জাতি গঠনে শিশুদের মনে এই মানসিকতা জাগিয়ে তুলতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সর্বাধিক। আর এ লক্ষ্যে সব শিশুর স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে যাতে ঝরে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে। কারিকুলাম হতে হবে সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক এবং একটি বাস্তব সম্মত গণমুখী যুগপযোগি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৯. শিশুদের পড়াশুনায় আগ্রহী করতে বেশি করে আরো গ্রন্থাগার বা পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে। গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অণ্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন করে শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। পড়াশোনাই হবে শিশুদের প্রধান ব্রত। এমন একটি সংস্কৃতি আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

১০. শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে নিশ্চিত করতে হবে যাতে সকল শিশু সমান ভাবে সুযোগ লাভ করে। এ ক্ষেত্রে কেউ যেন বৈষম্য, ভেদাভেদ এর শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষা বাণিজ্যিকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘের United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF সবসময়ই বাংলাদেশে শিশু অধিকার সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতবদ্ধ এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে যেসব দুর্বলতা রয়েছে তা পরিমার্জন করে বাস্তবসম্মত করার পক্ষে। এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. শেষ কথা

আগামী দিনে প্রতিটি শিশুই হোক মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন গুণী মানুষ। একই সাথে মানবতাবাদী, দেশদরদী, জনহিতৈষী। যে যে অবস্থানেই থাকুক কেন—প্রত্যেকেই মানুষ ও সমাজের জন্য বিশেষ করে অনগ্রসর মানুষদের সামনে নিয়ে আসার ব্রত নিয়ে কাজ করবে। শিশুদের জন্য একটি উন্নত সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাদের যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেই কেবল টেকসই উন্নয়নের ভিত রচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তথ্যপঞ্জি

Bangladesh on Development Highway: The Time is Ours, Budget Speech 2017-18, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, 2017.

Government of Bangladesh : The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dhaka, 2008.

Internet : www.unicef.org/bangladesh/.

Rahman, W. 1997: *Child Labor Situation in Bangladesh : A Rapid Assessment*, International Labor Organization.

আলম, শফিউল: প্রাথমিক শিক্ষায় ভিন্ন ধারা: কিন্ডারগার্টেন, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

আহমদ, গিয়াসউদ্দিন : শিক্ষক প্রশিক্ষণ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৭।

জন ভি. ভি. : "শিক্ষা ও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ", শিক্ষা এক নি:শব্দ বিপ্লব (স্বরাজ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ৯) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

বেগম, রেহেনা : প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থা, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

মিত্র, বিনয় : *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রূপ ও রীতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।

যতীন সরকার : শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, ভূমিকা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

রায়, অজয় : শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা: কিছু অনিয়মিত ভাবনা, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

শস্ত্রপাণি, মহসিন : শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য-উদ্ধারের পথ কী, *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা* (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

সমকাল, কালের কণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।